গোয়েন্দা ফেলুদার এ্যাডভেঞ্চার

টেলিফোনটা কে করেছিল ফেলুদা ?

প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারলাম যে বোকামি করেছি, কারণ যোগব্যায়াম করার সময় ফেলুদা কথা বলে না। এক্সারসাইজ ছেড়ে ফেলুদা এ-জিনিসটা সবে মাস ছয়েক হল ধরেছে। সকালে আধঘন্টা ধরে নানারকম 'আসন' করে সে। এমনকি, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা নীচের দিকে আর পা উপর দিকে শূন্যে তুলে শীর্ষাসন পর্যন্ত। এটা স্বীকার করতেই হবে যে এক মাসে ফেলুদার শরীর আরো ‘ফিট’ হয়েছে বলে মনে

হয়; কাজেই বলতে হয় যে যোগাসনে রীতিমত উপকার হচ্ছে।

প্রশ্নটা জিগ্যেস করেই পিছন দিকে টেবিলের উপরে রাখা ঘড়ির টাইমটা দেখে নিলাম। ঠিক সাড়ে সাত মিনিট পরে আসন শেষ করে ফেলুদা জবাব দিল -

'তুই চিনবি না।'

এতক্ষন পরে এরকম একটা উত্তর পেয়ে ভারী রাগ হল। চিনি না ত অনেককেই, কিন্তু নামটা বলতে দোষ কী? আর না চিনলেও, চিনিয়ে দেওয়া যায় না কি? একটু গম্ভীর ভাবেই জিগ্যেস করলাম, 'তুমি চেন ?'

ফেলুদা জলে-ভেজানো ছোলা খেতে খেতে বলল, 'আগে চিনতাম না এখন চিনি।'

কয়েকদিন হল আমার পূজোর ছুটি হয়ে গেছে। বাবা তিনদিন হল জামসেদপুরে গেছেন কাজে। বাড়িতে এখন আমি, ফেলুদা আর মা। এবার আমরা পূজোয় বাইরে যাব না। তাতে আমার বিশেষ আপশোস নেই, কারণ পূজোয় কলকাতাটা ভালোই লাগে, বিশেষ করে যদি ফেলুদা সঙ্গে থাকে। ওর আজকাল শখের গোয়েন্দা হিসাবে বেশ নামটাম হয়েছে, কাজেই মাঝে মাঝে যে রহস্য সমাধানের জন্য ওর ডাক পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী? এর আগে প্রত্যেকটা রহস্যের ব্যাপারেই আমি ফেলুদার সঙ্গে ছিলাম। ভয় হয় ওর নাম বেশি হওয়াতে হঠাৎ যদি ও একদিন বলে বসে 'নাঃ, তোকে আর এবার সঙ্গে নেব না।' কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা ঘটেনি। আমার বিশ্বাস ওর আমাকে সঙ্গে রাখার একটা কারণ আছে। হয়ত সঙ্গে একটা অল্পবয়স্ক ছেলেকে দেখে অনেকেই ওকে গোয়েন্দা বলে ভাবতে পারে না। সেটা ত একটা মস্ত সুবিধে। গোয়েন্দারা যতই আত্মগোপন করে থাকতে পারে ততই তাদের লাভ।

'ফোনটা কে করল জানতে খুব ইচ্ছে করছে বোধহয় ?'

এটা ফেলুদার একটা কায়দা। ও যখনই বুঝতে পারে আমার কোন একটা জিনিস জানবার খুব আগ্রহ, তখনই সেটা চট্ করে না বলে আগে একটা সাস্পেন্স তৈরি করে। সেটা আমি জানি বলেই বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললাম, 'ফোনটার সঙ্গে যদি কোন রহস্যের ব্যাপার জড়িয়ে থাকে তাহলে জানতে ইচ্ছে করে বৈকি।'

ফেলুদা গেঞ্জির উপর তার সবুজ ডোরাকাটা শার্টটা চাপিয়ে নিয়ে বলল, লোকটার নাম নীলমনি সান্যাল। রোল্যান্ড রোডে থাকে। বিশেষ জরুরী দরকারে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

'কী দরকার বলেনি ?'

'না। সেটা ফোনে বলতে চায় না। তবে গলা শুনে মনে হল ঘাবড়েছে।'

‘কখন যেতে হবে ?’

‘ট্যাক্সিতে করে যেতে মিনিট দশেক লাগবে। ন'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সুতরাং আর দু'মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়া উচিত ।’

ট্যাক্সি করে নীলমনি সান্যালের বাড়ি যেতে যেতে ফেলুদাকে বললাম, ‘অনেক রকম ত দুষ্টু লোক থাকে; ধর নীলমনিবাবুর যদি কোনরকম বিপদ না হয়ে থাকে - তিনি যদি শুধু তোমাকে প্যাঁচে ফেলার জন্যই ডেকে থাকেন ।’

ফেলুদা রাস্তার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, ‘সে রিস্ক ত থাকেই তবে সেরকম লোক বাড়িতে ডেকে নিয়ে প্যাঁচে ফেলবে না, কারন সেটা তাদের পক্ষেও রিস্কি হয়ে যাবে। সে সব কাজের জন্য অল্প টাকায় ভাড়াটে গুন্ডার কোন অভাব নেই ।’

একটা কথা বলা হয়নি - ফেলুদা গত বছর অল ইন্ডিয়া রাইফ্‌ল কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। মাত্র তিনমাস বন্দুক শিখেই ওর যা টিপ হয়েছিল সে একেবারে থ মেরে যাবার মত। ফেলুদার এখন বন্দুক রিভলভার দুই-ই আছে, তবে বইয়ের ডিটেকটিভের মত ও সারাক্ষণ রিভলভার নিয়ে ঘোরে না। সত্যি বলতে কি, এখন পর্যন্ত ফেলুদাকে ও দুটোর একটাও ব্যবহার করতে হয়নি; তবে কোনদিন যে হবে না সে কথা কী করে বলব ?

ট্যাক্সি যখন ম্যাডক্ স্কোয়ারের কাছাকাছি এসেছে, তখন জিগ্যেস করলাম, ‘ভদ্রলোক কী করেন সেটা জান ?’

ফেলুদা বলল, ‘ভদ্রলোক পান খান, বোধহয় কানে একটু কম শোনেন, ‘‘ইয়ে’’ শব্দটা একটু বেশি ব্যবহার করেন, আর অল্প সর্দিতে ভুগছেন - এ ছাড়া আর কিছুই জানি না ।’

এর পরে আর আমি কিছু জিগ্যেস করিনি ।

নীলমণি সান্যালের বাড়িতে পৌঁছতে ট্যাক্সিভাড়া উঠল এক টাকা সত্তর পয়সা। একটা দুটাকার নোট বার করে ট্যাক্সিওয়ালার হাতে দিয়ে ফেলুদা হাতের একটা কায়দার ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিল যে তার চেঞ্জ ফেরত চাই না। গাড়ি থেকে নেমে পোর্টিকোর তলা দিয়ে গিয়ে সামনের দরজায় পৌঁছে কলিং বেল টেপা হল ।

দোতলা বাড়ি, তবে খুব যে বড় তাও নয়, আর খুব পুরোনও নয় । সামনের দিকে একটা বাগানও আছে, তবে সেটা খুব বাহারের কিছু নয় ।

একজন দারোয়ান গোছের লোক এসে ফেলুদার কাছ থেকে ভিজিটিং কার্ড নিয়ে আমাদের বৈঠকখানায় বসতে বলল । ঘরে ঢুকে

চারিদিকে তাকিয়ে বেশ তাক লেগে গেল। সোফা, টেবিল, ফুলদানি, ছবি, কাঁচের আলমারিতে সাজান নানরকম সুন্দর পুরোন জিনিস-টিনিস মিলিয়ে বেশ একটা জমকালো ভাব। মনে হয় অনেক খরচ করে মাথা খাটিয়ে এসব জিনিস কিনে সাজানো হয়েছে।

ফেলুদা নিজেই উঠে পাখার রেগুলেটারটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। গায়ে স্লীপিং সুটের পায়জামার উপর একপাশে বোতামওয়ালা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, আর দুহাতের আঙুলে অনেকগুলো আংটি। হাইট মাঝারি, দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথায় চুল বেশি নেই, মোটামুটি ফরসা, আর চোখ দুটো ঢুলুঢুলু - দেখলে মনে হয় এই বুঝি ঘুম থেকে উঠে এলেন। বয়স কত হবে? পঞ্চাশের বেশি নয় ।

‘আপনারই নাম প্রদোষ মিত্তির ?’ জিগ্যেস করলেন। ‘আপনি যে এত ইয়াং সেটা জানা ছিল না ।’

ফেলুদা একটু হেঁ হেঁ করে আমার দিকে দেখিয়ে বললেন, ‘এটি আমার খুড়তুতো ভাই। খুব বুদ্ধিমান ছেলে। আপনি চাইলে আমাদের কথাবার্তার সময় আমি ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারি ।’

আমার বুকটা ধুক্‌ধুক্‌ করে উঠল। কিন্তু ভদ্রলোক আমার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বললেন, ‘কেন, থাকুক না - কোনো ক্ষতি নেই ।’ তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, ‘ইয়ে - আপনারা কিছু খাবেন-টাবেন? চা বা কফি?’

‘নাঃ । এই সবে চা খেয়ে বেরিয়েছি ।’

‘বেশ, তাহলে আর সময় নষ্ট না করে কেন ডেকেছি সেইটে বলি। তবে তার আগে আমার নিজের পরিচয়টা একটু দিই। বুঝতেই পারছেন আমি একজন সৌখীন লোক। পয়সা কড়িও কিছু আছে সেটাও নিশ্চয়ই অনুমান করেছেন । তবে বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি চাকরিও করি না, ব্যবসাও করি না, বা বাপের সম্পত্তিও এক পয়সাও পাইনি ।’

নীলমনিবাবু রহস্য করার ভাব করে চুপ করলেন।

ফেলুদা বলল, 'তাহলে কি লটারি ?’

‘আজ্ঞে ?’

‘বলছিলাম - তাহলে কি কখনো লটারি-টটারি জিতেছিলেন ?’

‘এগজ্যাক্টলি !’ ভদ্রলোক প্রায় ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে উঠলেন । ‘এগারো বছর আগে রেঞ্জার্স লটারি জিতে এক ধাক্কায় পেয়ে যাই প্রায় আড়াই লাখ টাকা। তারপর সেই টাকা দিয়ে, খানিকটা বুদ্ধি আর খানিকটা ভাগ্যের জোরে, বেশ ভালভাবেই চালিয়ে এসেছি । বাড়িটা

তৈরি করি বছর আষ্টেক আগে। আপনি হয়ত ভাবছেন, এরকম অকেজোভাবে একটা মানুষ বেঁচে থাকে কী করে; কিন্তু আসলে একটা কাজ আমার আছে - একটাই কাজ - সেটা হল অকশন থেকে এইসব জিনিসপত্র কিনে ঘর সাজানো !'

ভদ্রলোক তাঁর ডান হাতটি বাড়িয়ে চারিদিকের সাজানো জিনিসপত্রগুলোর দিকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন -

'যে ঘটনাটা ঘটেছে তার সঙ্গে আমার এইসব আর্টিস্টিক জিনিসপত্তরের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হয় যে হয়ত থাকতেও পারে। এই যে -'

নীলমনিবাবু তাঁর পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা কাগজের টুক্‌রো বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কাগজগুলো দেখে নিলাম। তিনটে কাগজ, তার প্রত্যেকটাতেই লেখার বদলে লাইন করে ছোট ছোট ছবি আঁকা । সেই ছবির মধ্যে কিছু কিছু বেশ বোঝা যায় - যেমন, প্যাঁচা, চোখ, সাপ, সূর্য - এইসব । আমার কেমন যেন ব্যাপারটাকে দেখা দেখা বলে মনে হচ্ছিল, এমন সময় ফেলুদা বলল, 'এইসব ত হিয়েরোগ্লিফিক লেখা বলে মনে হচ্ছে ।'

ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'আজ্ঞে ?'

ফেলুদা বলল, 'প্রাচীনকালে ইজিপ্সিয়ানরা যে লেখা বার করেছিল, এটা সেই জিনিস বলে মনে হচ্ছে ।'

'তাই বুঝি ?'

'হুঁ । তবে এ লেখা পড়তে পারে এমন লোক কলকাতায় আছে কিনা সন্দেহ ।'

ভদ্রলোক যেন একটু মুষড়ে পড়ে বললেন, 'তাহলে? যে জিনিস দুদিন অন্তর অন্তর ডাকে আমার নামে আসছে, তার মানে না করতে পারলে ত ভারী অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে ! ধরুন যদি এগুলো সাংকেতিক হুম্‌কি হয় - কেউ হয়ত আমাকে খুন করতে চাইছে, আর তার আগে আমাকে শাসাচ্ছে ।'

ফেলুদা একটুক্ষন চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার যে সমস্ত জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে - তার মধ্যে ঈজিপ্সিয়ান কিছু আছে ?'

নীলমনিবাবু হেসে বললেন, 'দেখুন, আমার কোন জিনিস যে কোথাকার, সেটা আমি নিজেই ঠিক ভালোভাবে জানি না। আমি কিনি, কারন আমার পয়সা আছে এবং আর পাঁচজন সৌখিন লোককে এসব জিনিস কিনতে দেখেছি, তাই ।'

'কিন্তু আপনার এত জিনিসের মধ্যে একটিকেও ত খেলো বলে মনে হচ্ছে না । যারা শুধু এগুলো দেখবে, তারা তো আপনাকে

রীতিমত সমঝদার লোক বলে মনে করবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ওটা কী জানেন ? এসব ব্যাপারে সচরাচর জিনিস ভালো হলেই তার দাম বেশি হয়। টাকা যখন আছে, তখন আমি সেরা জিনিসটা কিনব না কেন ! অনেক ভারী ভারী খদ্দেরের উপরে টেক্কা দিয়ে নীলাম থেকে এসব কিনেছি মশাই, কাজেই ভালো জিনিস আমার কাছে থাকাটা কিছু আশ্চর্য নয়।'

'কিন্তু মিশরের জিনিস কিছু আছে কিনা জানেন না ?'

নীলমণিবাবু সোফা ছেড়ে উঠে একটা কাঁচের আলমারির দিকে গিয়ে তার উপরের তাক থেকে একটা বিঘতখানেক লম্বা মূর্তি নামিয়ে এনে সেটা ফেলুদার হাতে দিলেন। সবুজ পাথরের মূর্তি, তার গায়ে আবার নানা রঙের ঝলমলে পাথর বসানো। দু-এক জায়গায় যেন সোনাও রয়েছে। তবে আশ্চর্য এই যে, মূর্তিটার শরীর মানুষের মত হলেও, তার মুখটা শেয়ালের মত। 'এটা দিন দশেক আগে কিনেছি অ্যারাটুন ব্রাদার্সের একটা নীলাম থেকে। এটা বোধহয় -'

ফেলুদা মূর্তিটায় একবার চোখ বুলিয়েই বলল, 'আনুবিস।'

'আনুবিস ? সে আবার কী ?'

ফেলুদা মূর্তিটা সাবধানে নেড়েচেড়ে নীলমণিবাবুর হাতে ফেরৎ দিয়ে বলল, 'আনুবিস ছিল প্রাচীন মিশরের গড অফ দ্য ডেড। মৃত আত্মাদের দেবতা। .... চমৎকার জিনিস পেয়েছেন এটা।'

'কিন্তু - 'ভদ্রলোকের গলায় ভয়ের সুর '- এই মূর্তি আর এইসব চিঠির মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি ? আমি কি এটা কিনে ভুল করলাম ? কেউ কি এটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে বলে শাসাচ্ছে ?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা বলা মুশকিল। চিঠিগুলো কবে থেকে পেতে শুরু করেছেন ?'

'গত সোমবার থেকে।'

'অর্থাৎ, মূর্তিটা কেনার ঠিক পর থেকেই ?'

'হ্যাঁ।'

'খামগুলো আছে ?'

'না, ফেলে দিয়েছি। রেখে দেওয়া হয়ত উচিত ছিল - তবে খুবই সাধারণ খাম, সাধারন টাইপরাইটারে ঠিকানা লেখা। পোস্টঅফিস এলগিন রোড।'

'ঠিক আছে।' ফেলুদা উঠে পড়ল। 'আপাতত কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। শুধু সেফ সাইডে থাকার জন্য মূর্তিটাকে ওই আলমারিতে না রেখে আপনার হাতের কাছে রাখবেন। সম্প্রতি একজনদের বাড়ি থেকে এ ধরনের কিছু জিনিস চুরি হয়েছিল।'

তাই বুঝি ?

'হ্যাঁ। একজন সিন্ধি ভদ্রলোক। যদ্দুর জানি এখনো সে চোর ধরা পড়েনি।' আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে ল্যান্ডিং-এ এলাম।

ফেলুদা বলল, 'আপনার সঙ্গে রসিকতা করতে পারে এমন কারুর কথা মনে পড়ছে ?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'কেউ না। পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

'আর শত্রু ?'

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, ‘ধনীর ত শত্রু সব সময়ই থাকে, তবে তারা ত কেউ আর শত্রু বলে নিজেদের পরিচয় দেয় না ! সামনা সামনি দেখা হলে সকলেই খাতির করে কথা বলে ।’

‘আপনি মূর্তিটা ত নীলামে কিনেছিলেন বললেন ।’

‘হ্যাঁ । অ্যারাটুন ব্রাদার্সের নীলামে ।’

‘ওটার ওপর আর কারো লোভ ছিল না ?’

কথাটা শুনে ভদ্রলোক হঠাৎ যেন বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে হাত কচলাতে শুরু করলেন । তারপর বললেন, ' আপনি কথাটা জিগ্যেস করে আমার ভাবনার একটা নতুন দিক খুলে দিলেন । আমার সঙ্গে একটি ভদ্র লোকের অনেকবার নীলামে ঠোকাঠুকি হয়েছে -- সেদিনও হয়েছিল ।'

‘তিনি কে ?’

‘প্রতুল দত্ত ।’

‘কী করেন ?’

বোধহয় উকীল ছিলেন । রিটায়ার করেছেন । সেদিন ওর আর আমার মধ্যে শেষ অবধি রেষারেষি চলে । তারপর আমি বারো হাজার বলার পর উনি থেমে যান । মনে আছে, নীলামের পর আমি যখন বাইরে এসে গাড়িতে উঠছি, তখন হঠাৎ ওর সঙ্গে একবার চোখাচুখি হয়ে পড়ে। ওর চোখের চাহনিটা মোটেই ভালো লাগেনি ।’

‘আই সী ।’

আমরা নীলমনিবাবুর বাড়ি থেকে বেরোলাম । গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফেলুদা প্রশ্ন করল, ‘এ বাড়িতে কি আপনারা অনেকে থাকেন?’

নীলমনিবাবু হেসে বললেন, 'কী বলছেন মশাই ? আমার মত একা মানুষ বোধ হয় কলকাতায় দুটি নেই । ড্রাইভার, মালি, দুটি পুরোন বিশ্বস্ত চাকর, ও আমি - ব্যস !’

ফেলুদার পরের প্রশ্নটা একেবারেই এক্সপেক্ট করিনি -

‘বাচ্চা ছেলে কি কেউ থাকে না এ বাড়িতে ?’

ভদ্রলোক একমুহূর্তের জন্য একটু অবাক হয়ে তারপর হো হো করে হেসে বললেন, ‘দেখেছেন - ভুলেই গেছি ! আসলে আমি লোক বলতে বয়স্ক লোকের কথাই ভাবছিলাম ! আজ দিন দশেক হল আমার ভাগনে ঝুন্টু এখানে এসে রয়েছে । ওর বাবা ব্যবসা করেন । এই সেদিন সস্ত্রীক জাপানে গেছেন । ঝুন্টুকে রেখে গেছেন আমার জিম্মায় । বেচারি এসে অবধি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে ।’

তারপর হঠাৎ ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, ‘আপনার বাচ্চার কথা মনে হল কেন ?’

ফেলুদা বলল, ‘বৈঠক খানার একটা আলমারির পিছন থেকে একটা ঘুড়ির কোনা উঁকি মারছিল। সেইটে দেখেই . . . ’

নীলমনিবাবুর চাকর একটা ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েছিল, সেটা নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে কড় কড় শব্দ করে পোর্টিকোর তলায় ঠিক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফেলুদা ট্যাক্সিতে ওঠার সময় বলল, ‘সন্দেহজনক আরো কিছু যদি ঘটে তাহলে তৎক্ষনাৎ আমাকে জানাবেন। আপাতত আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।’

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদাকে বললাম, ‘শেয়াল দেবতার চেহারাটা দেখে কিরকম ভয় করে - তাই না ?’

ফেলুদা বলল, ‘মানুষের ধড়ে অন্য যে কোন জিনিসের মাথা জুড়ে দিলেই ভয় করে - শুধু শেয়াল কেন ?’

আমি বললাম, 'পুরোন ঈজিপ্সিয়ান দেবদেবীর মূর্তি ঘরে রাখা ত বেশ বিপজ্জনক।’

‘কে বলল ?’

‘বাঃ - তুমিই ত বলেছিলে।’

‘মোটেই না। আমি বলেছিলাম, যেসব প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন ঈজিপ্সিয়ান মূর্তি-টূর্তি বার করেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বেশ নাজেহাল হতে হয়েছে।’

‘হ্যাঁ - হ্যাঁ - সেই যে একজন সাহেব - সে ত মরেই গিয়েছিল - কী নাম না ?’

‘লর্ড কারনারভন।’

‘আর তার কুকুর . . . ?’

‘কুকুর তার সঙ্গে ছিল না। কুকুর ছিল বিলেতে। সাহেব ছিলেন ঈজিপ্টে। তুতানখামেনের কবর খুঁড়ে বার করার কিছুদিনের মধ্যেই কারনারভন হঠাৎ ভীষণ অসুখে পড়ে মারা যান। তারপরে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, যে সময় সাহেব মারা যান, ঠিক সেই একই সময় বিনা অসুখে রহস্যজনকভাবে বেশ কয়েক হাজার মাইল দূরে তার কুকুরটিও মারা যায়।

প্রাচীন ঈজিপ্টের কোন জিনিস দেখলেই আমার ফেলুদার কাছে শোনা এই অদ্ভুত ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। শেয়ালদেবতা আনুবিসের মূর্তিটাও নিশ্চয়ই কোন মান্ধাতার আমলের ঈজিপ্সিয়ান সম্রাটের কবর থেকে এসেছে। নীলমনিবাবু কি এসব কথা জানেন না? সাধ করে বিপদ ডেকে আনার মধ্যে কী মজা থাকতে পারে তা ত আমি ভেবেই পাই না।

পরদিন ভোর পৌনে ছটায় আমাদের বারান্দায় খবরের কাগজের বান্ডিলটা পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি ফোনটা তুলে হ্যালো বলেছি, কিন্তু উল্টোদিকের কথা শোনার আগেই ফেলুদা সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। পর পর তিনবার 'হু', দুবার 'ও', আর একবার 'আচ্ছা ঠিক আছে' বলেই ফোনটা ধপ করে রেখে দিয়ে ও ধরাগলায় বলল, 'আনুবিস গায়েব। এক্ষুনি যেতে হবে।'

সকাল বেলায় ট্রাফিক কম বলে নীলমনি সান্যালের বাড়ি পৌঁছাতে লাগল ঠিক সাত মিনিট। ট্যাক্সি থেকে নেমেই দেখি নীলমণিবাবু কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা ভাব করে বাড়ির বাইরেই আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। ফেলুদাকে দেখেই বললেন, 'নাইটমেয়ারের মধ্যে দিয়ে গেছি মশাই। এরকম হরিব্‌ল অভিজ্ঞতা আমার কক্ষনো হয়নি।'

আমরা ততক্ষনে বৈঠকখানায় ঢুকেছি। ভদ্রলোক আমাদের আগেই সোফায় বসে প্রথমে তাঁর হাতের কব্জিগুলো দেখালেন। দেখলাম, লোকে যেখানে ঘড়ি পরে, তার ঠিক নীচ দিয়ে দুই হাতে দড়ির দাগ বসে গিয়ে হাতটা লাল হয়ে গেছে।

ফেলুদা বলল, 'কী ব্যাপার বলুন।'

ভদ্রলোক দম নিয়ে ধরা গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আপনার কথা মতো গতকাল মূর্তিটা শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে একেবারে বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে যেখানে ছিল সেখানেই রাখলে আর কিছু না হোক, অন্তত শারীরিক যন্ত্রণাটা ভোগ করতে হত না। যাক, গে - মূর্তিটা ত মাথার তলায় নিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছি, এমন সময় - রাত জানি না -একটা বিশ্রী অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কে জানি মুখটা আষ্টেপৃষ্টে গামছা দিয়ে বাধছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবার পথ বন্ধ দেখে হাত দিয়ে বাধা দিতে গেলুম, আর তখনই বুঝতে পারলুম যে আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী লোকের পাল্লায় পড়েছি। দেখতে দেখতে আমার হাত পিছমোড়া করে দিলে। ব্যস - তারপর বালিশের তলা থেকে মূর্তি নিতে আর কী ?

ভদ্রলোক দম নেবার জন্য কয়েক মুহর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঘন্টা তিনেক বোধহয় হাত বাধা অবস্থায় পড়ে ছিলুম। সমস্ত শরীরে ঝি ঝি ধরে গেসল। সকালে চাকর নন্দলাল চা নিয়ে এসে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে বাধন খুলে দেয়, আর তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে ফোন করি।'

ফেলুদার দেখলাম চোখ -মুখের ভাব বদলে গেছে। সে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার ঘরটা একবার দেখব, আর প্রয়োজন হলে আপনার বাড়ির কিছু ছবি তুলব। ক্যামেরাটাও ফেলুদার নতুন বাতিকের মধ্যে একটা।

নীলমণিবাবু দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকেই ফেলুদা বলল, 'একি - জানালার শিক নেই ?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, আর বলবেন না - বিলিতি কায়দার বাড়ি ত ! আর আমি আবার জানালা বন্ধ করে শুতেই পারি না ।

ফেলুদা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে দেখে বলল, খুব সহজ - পাইপ রয়েছে কার্নিশ রয়েছে । একটু জোয়ান লোক হলেই অনায়াসে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসতে পারে ।'

তারপর ফেলুদা ঘরের চারদিকে খুব ভাল করে দেখে নিয়ে ছবি-টবি তুলে বলল, বাড়ির অন্য অংশও এবার ঘুরে দেখতে চাই ।' নীলমনিবাবু প্রথমে দোতলা দেখালেন । পাশের ঘরটাতে দেখলাম একটা খাটে বারো-তেরো বছর বয়সের একটা ছেলে গলা অবধি লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে । তার চোখ গুলো বড় বড় আর দেখলেই মনে হয় তার স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নয় । বুঝলাম এই হল ঝন্টু । নীলমণিবাবু বললেন, 'কালই আবার ডাক্তার বোস ঝন্টুকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন । তাই ও রাত্রে কিছুই শুনতে পায়নি ।'

দোতলার আরো দুটো ঘর দেখে, একতলার ঘরগুলোতে চোখ বুলিয়ে আমরা বাড়ির বাইরে এলাম । নীলমণিবাবুর ঘরের জানলার ঠিক নীচেই দেখলাম কয়েকটা ফুলের টবে পামজাতীয় গাছ লাগানো । ফেলুদা টবগুলোর ভিতর কিছু আছে কি না দেখতে লাগল । প্রথম দুটোয় কিছু পেলো না । তৃতীয়টার পাতার ভিতর হাতড়ে একটা ছোট টিনের কৌটা পেলো । সেটার ঢাকনা খুলে নীলমণিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল, এ বাড়িতে কারুর নস্যির বাতিক আছে ?

নীলমণিবাবু মাথা নেড়ে না বললেন । ফেলুদা কৌটোটা নিজের প্যান্টের পকেটে রেখে দিল ।

এবার নীলমণিবাবু যেন বেশ মরিয়া হয়েই বললেন, 'মিস্টার মিত্তির - আর কিছু না - মূর্তি একটা গেছে, আরেকটা না হয় কিনব - কিন্তু একটা ডাকাত আমার বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমার উপর যা তা অত্যাচার করে চলে যাবে - এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না । আপনার এর একটা বিহিত করতেই হবে । যদি লোকটাকে ধরে দিতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে ইয়ে - মানে, ইয়ে আর কী -'

'পারিশ্রমিক ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ । পারিশ্রমিক - মানে, রিওয়ার্ড দেবো ।'

ফেলুদা বলল, 'রিওয়ার্ডটা বড় কথা নয় । সে আপনি দিতে চান দেবেন । কিন্তু আমি কাজটার ভার নিচ্ছি তার প্রধান কারণ হল, এ ধরনের অনুসন্ধানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে, একটা আনন্দ আছে ।'

এটা শুনে আমার মনে হল, বড় বড় গোয়েন্দাকাহিনীতে ডিটেকটিভরা যে ভাবে কথা বলে, ফেলুদাও যেন ঠিক সেইভাবেই কথাটা বলল ।

এর পরে প্রায় দশ মিনিট ধরে ফেলুদা নীলমণিবাবুর ড্রাইভার গোবিন্দ, চাকর নন্দলাল আর পাঁচু, আর মালি নটবরের সঙ্গে কথা বলল। তারা সবাই বলল রাত্রে অস্বাভাবিক কিছু দেখে নি। বাইরের লোক আসার মধ্যে এক রাত নটা নাগাৎ ডাক্তার বোস এসেছিলেন ঝন্টুকে দেখতে। নীলমণিবাবু নিজে নাকি তারপর একবার বেরিয়েছিলেন ও এন মুখার্জির ডাক্তারখানা থেকে ঝন্টুর জন্য ওষুধ কিনে আনতে।

ফেরার পথে একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল ট্যাক্সি আমাদের বাড়ির রাস্তা ছাড়িয়ে অন্য কোথাও চলেছে। ফেলুদাকে গম্ভীর দেখে তাকে আর কিছু জিগ্যেস করলাম না। ট্যাক্সি থামল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা বাড়ির সামনে। দেখলাম বাড়ির সদর দরজার উপরে সাইনবোর্ডে উঁচু উঁচু রূপোলি অক্ষরে লেখা রয়েছে - 'আরাটুন ব্রাদার্স - অকশনিয়ার্স।' এটাই সেই নীলামের দোকান।

আমি কোনোদিন নীলামঘর দেখিনি। এই প্রথম দেখে একেবারে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এত রকম হিজিবিজি জিনিস একসঙ্গে এর আগে কখনো দেখিনি।

ফেলুদার কাজ দুমিনিটের মধ্যে সারা হয়ে গেল। প্রতুল দত্তের ঠিকানা সেভেন্ বাই ওয়ান লাভলক্ স্ট্রীট। আমি মনে মনে ভাবলাম প্রতুল দত্তের বাড়ি গিয়েও যদি ফেলুদাকে হতাশ হতে হয়, তাহলে আর ওর কোথাও যাবার থাকবে না। তার মানে এবার ফেলুদাকে হার স্বীকার করতে হবে। আর তাহলে আমার যে কী দশা হবে তা জানি না। কারন এখন পর্যন্ত ফেলুদা কোথাও হার মানেনি। ও কোনো ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়ে মুখ চূণ করে বসে আছে - এ দৃশ্য আমি কল্পনাই করতে পারি না। আশা করি শিগ্গিরই ও একটা 'ক্লু' পেয়ে যাবে। আমি অন্তত এখন পর্যন্ত চোখে অন্ধকার দেখছি।

দুপুরে খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'এর পর ?'

ও ভাতের ঢিপির মধ্যে একটা গর্ত করে তাতে এক বাটি সোনামুগ ডাল ঢেলে বলল, 'এর পর মাছ। তারপর চাটনি, তারপর দই।'

'তারপর ?'

'তারপর জল খেয়ে মুখ ধোব। তারপর একটা পান খাব।'

'তারপর ?'

'তারপর একটা টেলিফোন করে আধঘন্টা ঘুম দেবো।'

এর মধ্যে টেলিফোনটাই একমাত্র ইন্টারেস্টিং খবর, কাজেই আমি সেটার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

ডিরেকটারি থেকে প্রতুল দত্তর নম্বরটা আমি বার করে দিয়েছিলাম। নম্বরটা ডায়াল করে 'হ্যালো' বলার সময় দেখলাম ফেলুদা গলাটা একদম চেঞ্জ করে বুড়োর গলা করে নিয়েছে। যে কথাটা হোল ফোনে, তার শুধু একটা দিকই আমি শুনতে পেয়েছিলাম, আর সেইভাবেই সেটা লিখে দিচ্ছি -

'হ্যালো - আমি নাকতলা থেকে কথা কইচি।'

-

'আজ্ঞে আমার নাম শ্রীজয়নারায়ণ বাগচি। আমি প্রাচীন কারুশিল্প সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। এই বিষয়ে নিয়ে আমি একটি পুস্তক রচনা করচি।'

-

'হ্যাঁ ..... আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সংগ্রহের কথা শুনেছি। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আপনার কিছু জিনিস আমাকে দেখতে দেন ....'

-

'না না না ! পাগল নাকি !

-

আচ্ছা।

-

হ্যাঁ - নিশ্চয়ই !

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কার।

টেলিফোন শেষ করে ফেলুদা বলল, ভদ্রলোকের বাড়িতে চুনকাম হচ্ছে - তাই জিনিস পত্র গুলো সরিয়ে রেখেছেন। তবে সন্ধ্যের দিকে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে।

আমি একটা কথা না বলে পারলাম না।

'কিন্তু প্রতুলবাবু যদি সত্যিই আনুবিসের মূর্তি চুরি করে থাকেন, তাহলে ত আর সেটা আমাদের দেখাবেন না।'

ফেলুদা বলল, যদি তোর মত বোকা হয় তাহলে দেখাতেও পারে ; তবে না দেখানোটাই সম্ভব । আমি মূর্তি দেখার জন্য যাচ্ছি না, যাচ্ছি লোকটাকে দেখতে ।

তার কথামত ফেলুদা টেলিফোনটা করেই নিজের ঘরে চলে গেল ঘুমোতে। ফেলুদার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা হল, ও যখন তখন প্রয়োজন মত একটু - আধটু ঘুমিয়ে নিতে পারে । শূনেছি নেপোলিয়নেরও নাকি এ ক্ষমতা ছিল ; যুদ্ধের আগে ঘোড়ায় চাপা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে নিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিতেন ।

আমার বিশেষ কিছুই করার ছিল না, তাই ফেলুদার তাক থেকে একটা ঈজিপ্সিয়ান আর্টের বই নিয়ে সেটা উল্‌টে পাল্‌টে দেখছিলাম, এমন সময় ক্রী-ং করে ফোনটা বেজে উঠল।

আমি এক দৌড়ে বসবার ঘরে গিয়ে ফোনটা তুলে নিলাম ।

'হ্যাঁলো !'

কিছুক্ষন কেউ কিছু বলল না, যদিও বেশ বুঝতে পারছিলাম ফোনটা কেউ ধরে আছে।

আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করল।

প্রায় দশ সেকেন্ড পরে একটা গম্ভীর, কর্কশ গলা শুনতে পেলাম।

প্রদোষ মিত্তির আছেন ?

আমি কোনমতে ঢোক গিলে বললাম, উনি একটু ঘুমোচ্ছেন। আপনি কে কথা বলছেন?

আবার কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর কথা এলো, ঠিক আছে। আপনি তাকে বলে দেবেন যে মিশরের দেবতা যেখানে যাবার সেখানেই গেছেন। প্রদোষ মিত্তির যেন এ ব্যাপারে আর নাক গলাতে না আসেন, কারণ তাতে কারুর কোন উপকার হবে না। বরং অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি।

এর পরেই কট্ করে ফোনটা রাখার শব্দ পেলাম, আর তার পরেই সব চুপ।

কতক্ষণ যে ফোনটা হাতে ধরে প্রায় দম বন্ধ করে বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ ফেলুদার গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি রিসিভারটাকে জায়গায় রেখে দিলাম।

‘কে ফোন করেছিল ?’

আমি ফোনে যা শুনেছি তা বললাম। ফেলুদা গম্ভীর মুখ করে ভুরু কুঁচকে সোফায় বসে বলল, ‘ইস - তুই যদি আমাকে ডাকতিস !’

‘কী করব ? কাঁচা ঘুম ভাঙালে যে তুমি রাগ কর।’

‘লোকটার গলার আওয়াজ কিরকম ?’

‘ঘরঘরে গম্ভীর।’

‘হুঁ .... । যাক্ গে, আপাতত প্রতুল দত্তর চেহারাটা একবার দেখে আসি। মনে হচ্ছিল একটু আলো দেখতে পাচ্ছি ; এখন আবার সব ঘোলাটে।

ছ’টা বাজতে পাঁচ মিনিটে আমরা প্রতুল দত্তর বাড়ির গেটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি যে বাবাও আমাদের দেখে চিনতে পারতেন না। ফেলুদা সেজেছে একটা ষাট বছরের বুড়ো। কাঁচা-পাকা মেশানো ঝোলা গোঁফ, চোখে মোটা কাঁচের চশমা, গায়ে কালো গলাবন্ধ কোট, হাঁটুর উপর ধুতি, আর মোজার উপর বাটার তৈরি ব্রাউন কেড্‌স জুতো। আধঘন্টা ধরে ঘরের দরজা বন্ধ করে মেক-আপ করে বাইরে এসেই বলল, তোর জন্য দু-তিনটে জিনিস আছে চট্ করে পরে নে।’

‘আমি অবাক হয়ে বললাম, আমাকে ও মেক আপ করতে হবে নাকি ?’

‘আলবৎ !’

দু মিনিটের মধ্যে আমার মাথায় একটা কদম-ছাঁট পরচুলা, আর আমার নাকের উপর একটা চশমা বসে গেল। তারপর একটা কালো পেন্সিল দিয়ে আমার পরিষ্কার করে ছাঁটা - জুলপিটা ফেলুদা একটু অপরিষ্কার করে দিল। তারপর বলল -

‘তুই আমার ভাগনে, তোর নাম সুবোধ - অর্থাৎ শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট ভালোমানুষটি। ওখানে মুখ খুলেছ কি বাড়ি এসে রদ্দা!’

প্রতুলবাবুর বাড়ির চুণকাম প্রায় হয়ে এসেছে। ডিজাইন দেখে বোঝা যায় বাড়ি অন্তত: পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পুরোন, তবে নতুন রঙের জন্য দরজা জানালা দেয়াল সব কিছু ঝলমল করছে।

গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গিয়েই দেখি বাইরে একটা খোলা বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসে আছেন। আমাদের এগোতে দেখেও তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও বুঝলাম তাঁর মুখটা বেশ গম্ভীর।

ফেলুদা দুহাত তুলে মাথা হেঁট করে নমস্কার করে তার নতুন বুড়ো মিহি গলায় বলল, ‘মাপ করবেন - আপনিই কি প্রতুলবাবু ?’

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, ‘হ্যাঁ।’

‘আজ্ঞে আমারই নাম জয়নারায়ণ বাগচি। আমিই আপনাকে আজ দুপুরে টেলিফোন করেছিলাম। এটি আমার ভাগনে সুবোধ।

‘আবার ভাগনে কেন? ওর কথা ত টেলিফোনে হয়নি।’

আমার মাথায় পরচুলা কুটকুট করতে শুরু করেছে।

ফেলুদা গলা ভীষণ নরম করে বলল, ‘আজ্ঞে ও ছবি আঁকা শিখছে তাই . . . ‘ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

‘আপনারা আমার জিনিসগুলি দেখতে চাইছেন তাতে আপত্তি নেই, তবে সরিয়ে রাখা জিনিস সব টেনে বার করতে হয়েছে। অনেক

হ্যাঙ্গাম। একে বাড়িতে রাতদিন মিস্ত্রিদের ঝামেলা, এটা ঠেলো, ওটা ঢাকো ....চারিদিক কাঁচা রঙ ....রঙের গন্ধটাও ধাতে যায় না। সব ঝক্কি শেষ হলে যেন বাঁচি। আসুন ভেতরে........'

লোকটাকে ভালো না লাগলেও, ভিতরে গিয়ে তার জিনিসপত্তর দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ।

ফেলুদা বলল, 'আপনার কাছে মিশর দেশের শিল্পকলার অনেক চমৎকার নিদর্শন রয়েছে দেখছি ।'

'তা আছে । কিছু জিনিস কায়রোতে কেনা, কিছু এখানে অকশনে।'

'দ্যাখো বাবা সুবোধ ভালো করে দ্যাখো ।' ফেলুদা আমার পিঠে একটা চিমটি কেটে আমায় জিনিসগুলোর দিকে ঠেলে দিল। 'কতরকম দেবদেবী - দ্যাখো! এই যে বাজপাখী, এও দেবতা, এই যে প্যাঁচা - এও দেবতা। মিশরদেশে কতরকম জিনিসকে পূজো করত লোকেরা দ্যাখো।'

প্রতুলবাবু একটা সোফায় বসে চুরুট ধরালেন।

হঠাৎ কী খেয়াল হল, আমি বলে উঠলাম, 'শেয়ালদেবতা নেই, বড় মামা ?

প্রশ্নটা শুনেই প্রতুলবাবু যেন হঠাৎ বিষম খেয়ে উঠলেন। বললেন, 'চুরুটের কোয়ালিটি ফল করছে। আগে এত কড়া ছিল না'

ফেলুদা সেই রকমই মিহি সুরে বললেন, 'হেঁ হেঁ - আমার ভাগনে আনুবিসের কথা বলছে। কালই ওকে বলছিলাম কিনা ?'

প্রতুলবাবু হঠাৎ ফোঁস করে উঠলেন, 'হুঁ !-আনুবিস ! স্টুপিড ফুল !'

'আজ্ঞে ?' ফেলুদা চোখ গোল গোল করে প্রতুলবাবুর দিকে চাইলেন । 'আনুবিসকে মুর্খ বলছেন আপনি ?'

আনুবিস না । সেদিন নীলামে -লোকটাকে আগেও দেখেছি আমি - হি ইজ এ ফুল। ওর বিডিং -এর কোন মাথামুন্ডু নেই। চমৎকার একটা মূর্তি ছিল। এমন এক অ্যাব্‌সাড দাম হাঁকলে যে যার ওপর আর চড়া যায় না। অত টাকা কোথায় পায় জানি না ।'

ফেলুদা চারিদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে নমস্কার করে বললেন, 'অশেষ ধন্যবাদ । আপনি মহাশয় ব্যক্তি।' পরম আনন্দ পেলাম আপনার শিল্প সংগ্রহ দেখে ।'

এসব জিনিসপত্র ছিল দোতলায় । আমরা এবার নীচে রওনা দিলাম । সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, 'আপনার বাড়িতে লোকজন আর বিশেষ . . . ?'

'গিন্নী আছেন। ছেলে বিদেশে।'

প্রতুল দত্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সির জন্য প্রায় হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম পাড়াটা কত নির্জন। সাতটাও বাজেনি, অথচ রাস্তায় প্রায় লোক নেই বললেই চলে। দুটি বাচ্চা ভিখারী ছেলে শ্যামা সংগীত গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। একটু কাছে এলে পরে বুঝলাম একজন গাইছে আর অন্যজন বাজাচ্ছে। ভারী সুন্দর গান করে ছেলেটা। ফেলুদা তাদের সঙ্গে গলা মিশিয়ে গেয়ে উঠল -

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা

আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা . . .

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে দিয়ে কিছুদুর হেঁটে একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সির দেখা পেয়েই ফেলুদা হাঁক দিয়ে সেটাকে থামালো। ওঠার সময় দেখি বুড়ো ড্রাইভার ভারী অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে দেখছে। এই চিমড়ে বুড়োর গলা দিয়ে ওরকম জোয়ান চীৎকার বেরোল কি করে সেটাই বোধহয় চিন্তা করছে ও।

পরদিন সকালে যখন টেলিফোনটা বাজল, তখন আমি বাথরুমে দাঁত মাজছি। কাজেই ফোনটা ফেলুদাই ধরল।

জিগ্যেস করে জানলাম নীলমণিবাবু ফোন করেছিলেন একটা খবর দেবার জন্য।

প্রতুলবাবুর বাড়িতেও কাল ডাকাতি হয়ে গিয়েছে, আর এ খবরটা কাগজেও বেরিয়েছে। টাকা পয়সা কিছু যায় নি; গেছে শুধু কিছু প্রাচীন কারুশিল্পের নমুনা। আট-দশটা ছোট ছোট জিনিস, সব মিলিয়ে যার দাম বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার কম না। পুলিশ নাকি তদন্ত আরম্ভ করে দিয়েছে।

প্রতুলবাবুর বাড়িতে যে সকালে পুলিশের দেখা পাবো, আর তার মধ্যে যে ফেলুদার চেনা লোকও বেরিয়ে পড়বে সেটা কিছুই আশ্চর্য না। আমরা যখন পৌছেছি তখন সোয়া সাতটা। অবিশ্যি আজ আর মেক-আপ করিনি। ফেলুদা দেখলাম তার জাপানি ক্যামেরাটা নিতে ভোলেনি।

আমরা গেটের ভিতর সবে ঢুকেছি-এমন সময় একজন বেশ হাসিখুশি মোটাসোটা চশমা পরা পুলিশ -বোধহয় ইন্‌স্পেক্টর-টিন্‌স্পেক্টর হবেন -- ফেলুদাকে দেখেই এগিয়ে এসে ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, 'কিহে, ফেলুমাস্টার! - গন্ধে গন্ধে এসে জুটেছ দেখছি!'

ফেলুদা বেশ নরমভাবেই হেসে বলল, 'আর কি করি বলুন -আমাদের ত ওই কাজ!'

'কাজ বোল না। কাজটা ত আমাদের। তোমাদের হল শখ। তাই না?'

ফেলুদা একথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'কিছু কিনারা করতে পারলেন ! বার্গলারি কেস ?'

তাছাড়া আর কি ? তবে ভদ্রলোক খুব আপসেট । খালি মাথা চাপড়াচ্ছেন আর বলছেন কাল এক বুড়ো নাকি এক ছোক্‌রা সঙ্গে করে ওঁর জিনিস দেখতে এসেছিল । ওঁর ধারণা এই দুজনই নাকি আছে এই বার্গলারির পেছনে ।'

আমার কথাটা শুনেই গলা শুকিয়ে গেল । সত্যি, ফেলুদা মাঝে মাঝে বড্ড বেপরোয়া কাজ করে ফেলে ।

ফেলুদা কিন্তু একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বলল, 'তাহলে ত সেই বুড়োর সন্ধান করতে পারলেই চোর ধরা পড়বে । এ তো জলের মতো কেস ।'

গোলগাল পুলিশটি বললেন, 'বেশ বলেছ -একেবারে খাঁটি উপন্যাসের গোয়েন্দার মত বলেছ -বাঃ !'

ভদ্রলোকের পারমিশন নিয়ে ফেলুদা আর আমি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম । প্রতুলবাবুর দেখি আজও সেই বারান্দাতেই বসে আছেন । বুঝলাম তিনি এতই অন্যমনস্ক যে আমাদের দেখেও দেখতে পেলেন না ।

'কোন ঘরটা থেকে চুরি হয়েছে দেখবে ?' মোটা পুলিশ জিজ্ঞেস করলো ।

'চলুন না ।'

কাল সন্ধেবেলা দোতলার যে ঘরটায় গিয়েছিলাম, আজও সেটাতেই যেতে হল। অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ফেলুদা সটান ঘরের দক্ষিণ দিকের ব্যালকনিটার দিকে চলে গেল । সেটা থেকে ঝুঁকে নীচের দিকে চেয়ে বলল, 'হুঁ, পাইপ বেয়ে অনায়াসে উঠে আসা যায়-তাই না ?'

মোটা পুলিশ বললেন, 'তা যায়। মুশকিল হচ্ছে কি -দরজার রং কাঁচা বলে ওটাকে আবার দুদিন থেকে বন্ধ করা হচ্ছিল না ।

'ঠিক কখন হয়েছে চুরিটা ?'

'রাত পৌনে দশটা ।'

'কে প্রথম টের পেল ?'

'এদের একটি পুরোন চাকর আছে, সে ওদিকের ঘরে বিছানা করছিল । একটা শব্দ পেয়ে দেখতে আসে । ঘর তখন অন্ধকার । বাতি জ্বালানোর আগেই সে একটা প্রচন্ড ঘুঁষি খেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই সুযোগে চোর বাবাজী হাওয়া ।'

ফেলুদার কপালে আবার সেই বিখ্যাত ভ্রূকুটি । বলল, 'একবার চাকরটার সঙ্গে কথা বলব ।'

চাকরের নাম বংশলোচন। দেখলাম ঘুঁষিটা খাওয়ার ফলে তার এখনো যন্ত্রণা আর ভয় -কোনটাই যায়নি। ফেলুদা বলল, 'কোথায় ব্যথা ?'

চাকরটা চিঁ চিঁ করে উত্তর দিল, 'তলপেটে।'

'তলপেটে ? ঘুঁষি তলপেটে মেরেছিল ?'

'সে কী হাতের জোর -বাপ্‌রে বাপ ! মনে হল যেন পেটে এসে একখানা পাথর লাগল। আর তার পরেই সব অন্ধকার।'

আওয়াজটা শুনলে কখন ? তখন তুমি কী করছিলে ?'

'টাইম ত দেখিনি বাবু। আমি তখন মায়ের ঘরে বিছানা করছি। দুটো ছেলে এসে কীর্তন গান করছিল তাই শুনেছিলাম। মা ঠাকরুণ ছিলেন পূজোর ঘরে ; বললেন ছেলেটাকে পয়সা দিয়ে আয়। আমি যাব যাব করছি এমন সময় বাবুর ঘর থেকে ঘটিবাটি পড়ার মত একটা শব্দ পেলাম। ভাবলাম -কেউ ত নাই -তা জিনিস পড়ে কেন ? তাই দেখতে গেছি -আর ঘরে ঢুকতেই . . .'

বংশলোচন আর কিছু বলতে পারল না।

সব শুনে -টুনে বুঝলাম, আমরা চলে যাবার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই চোর এসেছিল।

আমি ভাবলাম ফেলুদা বোধহয় আরো কিছু জিগ্যেস করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও আর কোন কথাই বলল না। সেই মোটা পুলিশকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে রাস্তায় এসে ফেলুদার মুখের চেহারা একদম বদলে গেল। এ চেহারা আমি জানি। ফেলুদা কী জানি একটা রাস্তা দেখতে পেয়েছে, আর সে রাস্তা দিয়ে গেলেই রহস্যের সমাধানে পৌছন যাবে।

পাশ দিয়ে খালি ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল, কিন্তু ফেলুদা থামাল না। আমার দুজনে হাঁটতে লাগলাম। ফেলুদার দেখাদেখি আমিও ভাবতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে খুব বেশিদূর এগোতে পারলাম না। প্রতুলবাবু যে চোর নন সেটা ত পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, যদিও প্রতুলবাবুকে বেশ জোয়ান লোক বলে মনে হয়, আর ওঁর গলায় আওয়াজটা বেশ ভারী। কিন্তু তাও এটা কিছুতেই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না যে, প্রতুলবাবু একটা বাড়ির পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠতে পারেন। তার জন্য যেন আরো অনেক কম বয়সের লোকের দরকার। তাহলে চোর কে ? আর ফেলুদা কোন জিনিসটার কথা এত মন দিয়ে ভাবছে ?

কিছুক্ষণ হাঁটার পরে দেখি আমরা নীলমণিবাবুর বাড়ির পাঁচিলের পাশে এসে পড়েছি। ফেলুদা পাঁচিলটা বাঁয়ে রেখে ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করল।

কিছুদূর গিয়ে পাঁচিলটা বাঁ দিকে ঘুরেছে। ফেলুদাও ঘুরল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও। এদিকে রাস্তা নেই, ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। মোড় ঘুরে আঠার কি উনিশ পা হাঁটার পর ফেলুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে পাঁচিলের একটা বিশেষ অংশের দিকে খুব মন দিয়ে দেখল। তারপর সেই জায়গাটার খুব কাছ থেকে একটা ছবি তুলল। আমি দেখলাম সেখানে একটা ব্রাউন রঙের হাতের ছাপ রয়েছে। পুরো হাত নয় - দুটো আঙুল আর তেলোর খানিকটা অংশ - কিন্তু তা থেকেই বোঝা যায় যে সেটা বাচ্চা ছেলের হাত।

এবার আমরা যে পথে এসেছিলাম সে পথে ফিরে গিয়ে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে সোজা একেবারে বাড়ির দিকে চলে গেলাম। খবর পাঠাতেই নীলমণিবাবু বেশ ব্যস্ত হয়ে নীচে চলে এলেন। আমরা তিনজনেই বৈঠকখানায় বসার পর নীলমণিবাবু বললেন, 'আপনি শুনলে কী বলবেন জানি না, তবে আমার মনটা আজ কালকের চেয়ে কিছুটা হাল্‌কা। আমার মত দুর্দশা যে আরেকজনেরও হয়েছে, সেটা ভেবে খানিকটা কষ্টের লাঘব হচ্ছে। কিন্তু তাও একটা প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া অবধি কষ্ট যাবে না-কোথায় গেল আমার আনুবিস ? বলুন ! আপনি এত বড় ডিটেকটিভ - দুটো দুটো ডাকাতি দুদিন উপরি উপরি হয়ে গেল আর আপনি এখনো যেই তিমিরে সেই তিমিরেই ?'

ফেলুদা একটা প্রশ্ন করে ফেলল।

'আপনার ভাগনেটি কেমন আছে ?'

'কে, ঝুন্টু ? ও আজ অনেকটা ভালো। ওষুধে কাজ দিয়েছে। আজ জ্বরটা অনেক কমে গেছে।'

'আচ্ছা -বাইরের কোন ছেলেটেলে কি পাঁচিল টপকে এখানে আসে ? ঝুন্টুর সঙ্গে খেলতে -টেলতে ?'

'পাঁচিল টপকে ? কেন বলুন ত ?

'আপনার পাঁচিলের বাইরের দিকটায় একটা বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ দেখছিলাম।'

'ছাপ মানে ? কিরকম ছাপ ?'

'ব্রাউন রঙের ছাপ।'

'টাট্‌কা ?'

'বলা মুশকিল - তবে খুব পুরোন নয় ।'

'কই, আমি ত কোনদিন কোন বাচ্চাকে আসতে দেখিনি। বাচ্চা বলতে এক আসে -তাও সেটা পাঁচিল টপকে নয় - একটা ছোক্‌রা ভিখারি । দিব্যি শ্যামাসংগীত গায়। তবে হ্যাঁ -আমার বাগানের পশ্চিম দিকে একটা জামরুল গাছ আছে । মধ্যে মধ্যে বাইরের ছেলে পাঁচিল টপকে এসে সে গাছের ফল পেড়ে খায় না, এমন গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না ।'

'হুঁ. . . '

নীমমণিবাবু এবার জিগ্যেস করলেন, 'চোরের বিষয় আর কিছু জানতে পারলেন কি ?'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল ।

'লোকটার হাতের জোর সাংঘাতিক । এক ঘুঁষিতে প্রতুলবাবুর চাকরকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল ।'

'তাহলে এচুরি-ওচুরি এক চোরই করেছে তাতে সন্দেহ নেই ।'

হতে পারে। তবে গায়ের জোরটা এখানে বড় কথা বলে আমার মনে হয় না । একটা বীভৎস বুদ্ধিরও ইঙ্গিত যেন পাওয়া যাচ্ছে ।'

নীলমণিবাবু যেন মুসড়ে পড়লেন। বললেন, আশা করি সে বুদ্ধিকে জব্দ করার মত বুদ্ধি আপনার আছে ! না হলে ত আমার মূর্তি ফিরে পাবার আশা ছাড়তে হয় ।'

ফেলুদা বলল, 'আরো দুটো দিন অপেক্ষা করুন । এখন পর্যন্ত কখনো ফেলু মিত্তিরের ডিফিট হয়নি ।'

নীলমণিবাবুর বাড়ির গাড়িবারান্দা থেকে গেট অবধি নুড়ি পাথর দেওয়া রাস্তা । সেটার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছি তখন একটা কট্‌ কট্‌ শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি নীলমণিবাবুর বাড়ির দোতলার একটা ঘরের জানালার পিছনে দাঁড়িয়ে একটা ছোট ছেলে -ঝুন্টুই বোধহয় - জানালার কাঁচটাতে হাত দিয়ে টোকা মারছে ।

আমি বললাম, 'ঝুন্টু ।'

ফেলুদা বলল, 'দেখেছি ।'

সারা দুপুর ফেলুদা তার নীল খাতায় অভ্যাসমত গ্রীক অক্ষরে কী সব হিজিবিজি লিখল। আমি জানি ভাষাটা আসলে ইংরিজি, কিন্তু অক্ষরগুলো গ্রীক, যাতে আর কেউ পড়ে মানে বুঝতে না পারে। আমার সঙ্গে ওর কথা একেবারই বন্ধ, তবে সেটা এক হিসেবে ভালো। এখন ওর ভাববার সময়, কথা বলার সময় নয়। মাঝে মাঝে শুনছিলাম ও গুন গুন করে গান গাইছে। এটা সেই ভিখিরি ছেলেটার গাওয়া রামপ্রসাদী গানটা।

বিকেলে পাঁচটা নাগাৎ চা খেয়ে ফেলুদা বলল, 'আমি একটু বেরুচ্ছি। পপুলার ফোটো থেকে আমার ছবির এনলার্জমেন্টগুলো নিয়ে আসতে হবে।'

আমি একাই বাড়িতে রয়ে গেলাম।

দিন ছোট হয়ে আসছে। তাই সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সূর্য ডুবে অন্ধকার হয়ে এলো। পপুলার ফোটো দোকানটা হাজরা রোডের মোড়ে। ফেলুদার ছবি নিয়ে ফিরে আসতে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগা উচিত না। তবে এত দেরী হচ্ছে কেন? অবিশ্যি অনেক সময় ছবি তৈরী না হলে দোকানে বসিয়ে রাখে। আশা করি অন্য কোথাও যায়নি ও। আমাকে ফেলে ঘোরাঘুরিটা আমার ভালো লাগে না।

একটা করতালের আওয়াজ কানে এলো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চেনা গলায় সেই গান -

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা

আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা . . .

সেই ছেলে দুটো। আজ আমাদের পাড়ায় ভিক্ষে করতে এসেছে।

গান ক্রমে এগিয়ে এলো। আমি আমাদের ঘরের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখান থেকে রাস্তাটা দেখা যায়। ওই যে ছেলে দুটো - একজন গাইছে, একজন করতাল বাজাচ্ছে। কী সুন্দর গলা ছেলেটার।

এবারে গান থামিয়ে ছেলেটি ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে মুখ করে বলল, 'মা দুটি ভিক্ষে দেবে মা?'

কী মনে হল, আমার ব্যাগ থেকে একটা পঞ্চাশ নয়া বার করে জানলা দিয়ে ছেলেটার দিকে ফেলে দিলাম। টিং শব্দ করে পয়সাটা মাটিতে পড়ল। দেখলাম ছেলেটা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝোলার মধ্যে পুরে আবার গান গাইতে গাইতে হাঁটতে শুরু করল।

একটা ব্যাপারে আমার মাথাটা কেমন জানি গোলমাল হয়ে গেল। যদিও আমাদের রাস্তাটা বেশ অন্ধকার, তবু ভিখিরি ছেলেটা

যখন ওপর দিকে মুখ করে ভিক্ষে চাইল তখন যেন মনে হল তার মুখের সঙ্গে ঝুন্টুর একটা আশ্চর্য মিল আছে। হয়ত এটা আমার দেখার ভুল, কিন্তু তাতে মনের মধ্যে কেমন খটকা লাগতে লাগল। আমি ঠিক করলাম ফেলুদা এলেই কথাটা ওকে বলব।

প্রায় সাড়ে ছটার সময় মেজাজ বেশ গরম করে ফেলুদা এনলার্জমেন্ট নিয়ে বাড়ি ফিরল। যা ভেবেছিলাম তাই, ওকে দোকানে বসে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বলল, 'এবার থেকে নিজেই একটা ডার্করুম তৈরী করে ছবি ডেভেলপিং-প্রিন্টিং করব। বাঙালী দোকানের কথার কোন ঠিক নেই।'

ফেলুদা যখন ওর বিছানার ওপর ছবিগুলো বিছিয়ে বসেছে, তখন আমি, ওকে গিয়ে ভিখিরি ছেলেটার কথা বললাম। ও কিন্তু একটুও অবাক না হয়ে বলল, 'সেটা আর আশ্চর্য কী?'

'আশ্চর্য না?'

'উঁহূ।'

'কিন্তু তাহলে ভীষণ গন্ডগোল বলতে হবে।'

'গন্ডগোল ত বটেই। সেটা ত আমি প্রথম থেকেই বুঝেছি।'

'তুমি বলতে চাও যে ওই ছেলেটা চুরির ব্যাপারে জড়িত?'

'হতেও পারে।'

'কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের ঘুঁষির এত জোর যে একটা ধেড়ে লোককে অজ্ঞান করে দেবে?'

'বাচ্চা ছেলে ঘুঁষি মেরেছে তা ত বলিনি।'

'তাও ভালো!'

যদিও ভালো বললাম, কিন্তু আসলে মোটেই ভালো লাগছিল না। ফেলুদাও যে কেন পরিস্কার করে কিছু বলছে না তা জানি না।

খাটের উপর বিছানো বারোটা ছবির মধ্যে দেখলাম একটা ছবি ফেলুদা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। কাছে গিয়ে দেখি সেটা আজই

সকালে তোলা নীলমনিবাবুর পাঁচিলে বাচ্চা ছেলের হাতের দাগের ছবিটা । এনলার্জমেন্টের ফলে হাতের তেলোটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে । বললাম, ‘তুমি ত বল হাত দেখতে জান - বল ত ছেলেটার কত আয়ু ।’

ফেলুদা কোন উত্তর দিল না । সে তন্ময় হয়ে ছবিটার দিকে চেয়ে আছে । লক্ষ্য করলাম যে তার মধ্যে একটা দারুণ কনসেনট্রেশনের ভাব ।

‘কিছু বুঝতে পারছিস ?’

হঠাৎ ওর প্রশ্নটা আমাকে একেবারে চমকে দিল ।

‘কী বুঝব ?’

‘সকালে কী বুঝেছিলি, আর এখন কী বুঝলি - বল ত ।’

‘সকালে ? মানে, যখন ছবিটা তুললে ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘কী আর বুঝব ? বাচ্চা ছেলের হাত -এ ছাড়া আর কী বোঝার আছে ?’

‘ছাপের রংটা দেখে কিছু মনে হয় নি ?

‘রং ত ব্রাউন ছিল ।’

‘তার মানে কী ?’

‘তার মানে ছেলেটার হাতে ব্রাউন রঙের কিছু একটা লেগেছিল ।’

‘কিছু মানে কী ? ঠিক করে বল ।’

‘পেন্ট হতে পারে ।’

‘ কোথাকার পেন্ট ?’

‘কোথাকার পেন্ট . . . কোথাকার . . . ?’

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ।

‘প্রতুলবাবুর ঘরের দরজার রং !’

‘এগ্‌জ্যাক্টলি । সেদিন তোরও সার্টের বাঁ দিকের আস্তিনে লেগেছিল । এখানো গিয়ে দেখতে পারিস লেগে আছে ।’

‘কিন্তু’-আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল, ‘ -যার হাতের ছাপ, সেই কি প্রতুলবাবুর ঘরে ঢুকেছিল ?

‘হতেও পারে। এখন বল - ছবি দেখে কী বুঝছিস ।’

আমি অনেক ভেবেও নতুন কিছু বোঝার কথা বলতে পারলাম না ।

ফেলুদা বলল, ‘তুই পারলে আশ্চর্য হতাম । শুধু আশ্চর্য হতাম না -- শক্ পেতাম । কারণ তাহলে বলতে হোত তোর আর আমার বুদ্ধিতে কোন তফাৎ নেই ।

‘তোমার বুদ্ধিতে কী বলছে ?’

‘বলছে যে এটা একটা সাংঘাতিক কেস । ভয়াবহ ব্যাপার । আনুবিস যেরকম ভয়ঙ্কর -- এই রহস্যটাও তেমনি ভয়ঙ্কর ।’

পরদিন সকালে ফেলুদা প্রথম নীলমনি সান্যালকে ফোন করল ।

‘হ্যালো-কে, মিস্টার সান্যাল ? . . . আপনার রহস্য সমাধান হয়ে গেছে . . . মূর্তি এখনো হাতে আসেনি, তবে কোথায় আছে মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছি . . . আপনি কি বাড়ি আছেন ? . . . অসুখ বেড়েছে ? . . . কোন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন . . . ও, আচ্ছা । তাহলে পরে দেখা হবে . . .’

ফোনটা রেখেই ফেলুদা চট্ করে আরেকটা নম্বর ডায়াল করল । ফিস্ ফিস্ করে কী কথা হল সেটা ভালো শুনতে পেলাম না - তবে ফেলুদা যে পুলিশে টেলিফোন করছে সেটা বুঝলাম। ফোনটা রেখেই ও আমাকে বলল, ‘এক্ষুনি বেরোতে হবে--তৈরী হয়ে নে ।’

একে সকালে ট্র্যাফিক কম, তার উপর ফেলুদা আবার ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলল টপ স্পীডে যেতে। দেখতে দেখতে আমরা নীলমনিবাবুর বাড়ির রাস্তায় এসে পড়লাম ।

গেটের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, তখন দেখি নীলমনিবাবু তাঁর কালো অ্যাম্ব্যাসাডরে বেরিয়ে বেশ স্পীডের মাথায় আমরা যেদিকে যাচ্ছি তার উলটো দিকে রওনা দিলেন । সামনে ড্রাইভার আর পিছনে নীলমনিবাবু ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না ।

‘আউর জোরসে’ - ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল । ট্যাক্সি ড্রাইভারও কিরকম এক্সাইটেড হয়ে অ্যাক্সিলারেটরে পা চেপে দিল । সামনের গাড়িটা দেখলাম বিশ্রী গোঁ গোঁ শব্দ করে ডান দিকে মোড় নিচ্ছে ।

এইবার ফেলুদা যে জিনিসটা করল সেটা এর আগে কক্ষনো করেনি ।

কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে হঠাৎ তার রিভালবারটা বার করে গাড়ির জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নীলমণিবাবুর গাড়ির পিছনের টায়ারের দিকে অব্যর্থ টিপ করে রিভলভারটা মারল।

প্রায় একই সঙ্গে রিভলভারের আর টায়ার ফাটার শব্দে কানে তালা লেগে গেল। দেখলাম নীলমণিবাবুর গাড়িটা বিশ্রী ভাবে রাস্তার একপাশে কেদরে গিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

আমাদের গাড়িটা নীলমণিবাবুর গাড়ির পিছনে থামতেই দেখি উল্টোদিক থেকে পুলিশের জীপ এসেছে।

এদিকে নীলমণিবাবু গাড়ি থেকে নেমে এসে ভীষণ বিরক্ত মুখ করে এদিক ওদিক চাইছেন।

ফেলুদা আর আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে নীলমণিবাবুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

পুলিশের জীপটাও কাছাকাছি এসে থেমেছে। দেখলাম সেটা থেকে নামলেন সেই মোটা অফিসারটি।

নীলমণিবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এসব কী হচ্ছে কী ?'

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, ‘আপনার সঙ্গে গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কে আছে জানতে পারি কী ?’

‘কে আবার থাকবে ?’ ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন । ‘বললাম ত আমি আমার ভাগনেকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি ।’

ফেলুদা এবার আর কিছু না বলে সোজা গিয়ে নীলমণিবাবুর গাড়ির দরজার হ্যান্ডলটা ধরে একটানে দরজাটা খুলে ফেলল।

খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে গাড়ি থেকে তীরের মত বেরিয়ে ফেলুদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর টুঁটি টিপে ধরল! কিন্তু ফেলুদা ত শুধু যোগব্যায়াম করে না ? ও রীতিমত যুযুৎসু আর কারাটে শিখেছে । ছেলেটার কবজি দুটো ধরে উল্টে তাকে অদ্ভুত কায়দায় মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আছাড় মেরে রাস্তায় ফেলল । যন্ত্রণার চোটে একটা চীৎকার ছেলেটার মুখ দিয়ে বেরোল, আর সে চীৎকার শুনে আমার রক্ত জল হয়ে গেল !

কারণ সেটা মোটেই বাচ্চার গলা নয় ।

সেটা একটা বয়স্ক লোকের বিকট হেঁড়ে গলার চীৎকার !

এই গলাই সেদিন আমি টেলিফোনে শুনেছিলাম !

ইতিমধ্যে পুলিশ এসে নীলমণিবাবুর গাড়ির ড্রাইভার আর ‘বাচ্চাটাকে’ ধরে ফেলল ।

ফেলুদা তার জামার কলারটা ঠিক করতে করতে বলল, ‘পাঁচিলের গায়ে হাতের ছাপ দেখেই ধরেছিলাম। অল্প বয়সের ছেলের হাতে এত লাইন থাকে না । তাঁদের হাত আরো অনেক মসৃণ থাকে । অথচ সাইজ যখন ছোট, তখন তার একটাই মানে হতে পারে। এটা আসলে একটা বেঁটে বামনের হাতের ছাপ । বাচ্চাটা আসলে আর কিছুই না - একটি ডোয়ার্ফ । কত বয়স হল আপনার সাকরেদের, নীলমণিবাবু ?'

‘চল্লিশ !’ ভদ্রলোকের গলা দিয়ে ভালো করে আওয়াজ বেরোচ্ছে না !

‘খুব বুদ্ধি খাটিয়েছেন যা হোক । আগে জিনিস চুরির মিথ্যে ঘটনাটা খাড়া করে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে, তারপর নিজেই লোক লাগিয়ে পরের জিনিস চুরি করছেন । আপনার বাড়িতে কাল যাকে দেখলাম সে কি সেই ভিখারী ছেলেটি ?’

নীলমণিবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন ।

‘তার মানে আপনার ভাগনে বলে আসলে কেউ নেই। ওকে বাড়িতে এনে ধরে রেখেছেন এই চুরির ব্যাপারে হেল্প করার জন্য ?’

ভদ্রলোক মাথা হেঁট করে চুপ করে রইলেন ।

ফেলুদা বলে চলল, ‘ছেলেটা গান গাইত আর বামনটা খঞ্জনী বাজাত । কেবল চুরির টাইম এলে খঞ্জনীটা ভিখারীর হাতে দিয়ে যেত, এবং তখন সে -ই বাজাতে থাকত। বামন বলেই তার গায়ের জোরের অভাব নেই । এক ঘুষিতে একজন জোয়ান লোককে ঘায়েল করতে পারে । ওয়ান্ডারফুল ! আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না নীলমণিবাবু ।’

নীলমণিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘মিশরের প্রাচীন জিনিসের উপর একটা নেশা ধরে গিয়েছিল। প্রচুর পড়াশুনা করেছি এই নিয়ে । সাধে কি প্রতুল দত্তের উপর হিংসা হয়েছিল ।’

ফেলুদা বলল, ‘অতি লোভে শুধু তাঁতিই নষ্ট হয় না, বামুনও হয় ।
কারণ আপনার ওই বেঁটেটিও বামুন, আর আপনি সান্যাল - একেবারে উচ্চ শ্রেণীর বামুন ! . . . যাক্‌গে - এবার একটা শেষ অনুরোধ আছে ।’

‘কী ?’

‘আমার রিওয়ার্ডটা ।’

নীলমণিবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন ।

‘রিওয়ার্ড !’

‘আনুবিসের মূর্তিটা আপনার কাছেই আছে বোধহয় ?’

ভদ্রলোকে কেমন যেন বোকার মত ডান হাতটা নিজের পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন।

হাতটা বার করতে দেখলাম তাতে রয়েছে এক বিঘত লম্বা কালো পাথরের উপর রঙীন মণিমুক্তা বসানো চার হাজার বছরের পুরোন মিশর দেশের শেয়ালমুখী দেবতা আনুবিসের মূর্তি।

ফেলুদা হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ।’

* * * * *

*All the illustrations were done by Ray in 1970 and never reprinted since